বিদায় শিল্পী, বীর মুক্তিযোদ্ধা

বুলবুল মহলানবীশ

শিল্প-সংস্কৃতির আলোকিত মানুষেরা একে একে না ফেরার দেশে চলে যাচ্ছেন। ঝরে পড়ছে একের পর এক তারা। না ফেরার দেশে চলে গেছেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক বুলবুল মহলানবীশ। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর ২০২৩ সালের ১৪ জুলাই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন গুণী এই শিল্পী। বুলবুল মহলানবীশের মৃত্যুতে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নেমে আসে শোকের ছায়া। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের অনেকেই তার চলে যাওয়ায় শোক প্রকাশ করেন। তরুণ প্রজন্মের কাছে এই গুণী মানুষটির জীবনের অনেক গল্পই অজানা। রঙবেরঙ এই গুণী এই মানুষটিকে নিয়ে করেছে বিশেষ এই আয়োজন।

মার্চ ১০, ১৯৫৩- জুলাই ১৪, ২০২৩

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শোক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের খ্যাতিমান শিল্পী এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা বুলবুল মহলানবীশের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন। এক শোক বার্তায় তিনি বলেন, 'বুলবুল মহলানবীশ একাধারে কবি, লেখক, গায়ক, আবৃত্তিশিল্পী, অভিনেতা এবং টেলিভিশন-বেতার-মঞ্চে শিল্প-সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ছিলেন। তিনি ছিলেন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। বুলবুলের মৃত্যুতে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। বিখ্যাত এই শিল্পী তার কাজের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর কাছে বেঁচে থাকবেন।'

ছোট্টবেলার বুলবুল মহলানবীশ

আদি ভিটা বিক্রমপুরে হলেও, বুলবুল ১৯৫৩ সালের ১০ মার্চ কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময় তার বাবার চাকরিসূত্রে তাদের পরিবার থাকতো কুমিল্লায়। বাবার বদলির চাকরিসূত্রে বুলবুল মহলানবীশের শৈশব কেটেছে ঢাকা, কুমিল্লা এবং করাচিতে। করাচিতে থাকাকালীন ১৯৬০ এর দশকের শুরুর দিকে শিল্পী রুনা লায়লার বাবা এমদাদ আলী প্রতিষ্ঠিত 'শিল্পীচক্রে' সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছেন। এমন সাংস্কৃতিক পরিবেশ একজন বুলবুল মহলানবীশ হয়ে উঠতে সহায়তা দিয়েছিল।

পঞ্চাশের দশকে প্রতিষ্ঠিত 'অভিযাত্রী ক্লাব' থেকে নানাবিধ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞের আয়োজন করা হতো। এর মধ্যে রবীন্দ্রজয়ন্তী, নজরুলজয়ন্তী, সুকান্তজয়ন্তী, বসন্ত উৎসব, যাত্রাপালা, নাটক মঞ্চায়ন, ধোলাইখালে নৌকা বাইচ আর পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ছিল অন্যতম। এসব কর্মযজ্ঞের ভেতর দিয়েই বুলবুল মহলানবীশ তার বাবা, কাকা, ভাই-বোনদের সঙ্গে বেড়ে উঠেন। বাড়িতে ছিল সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। ছিল কাব্য আর সংগীতের অবাধ বিচরণ। তার মা কাজের অবসরে বস্তির সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বাংলা-ইংরেজি বর্ণমালা শেখাতেন, সঙ্গে তালিম দিতেন অংকের। এর সবকিছুই বুলবুল মহলানবীশের ব্যক্তিত্ব গঠনে বড় রকম ছাপ ফেলেছিল। কী রকম ছাপ ফেলেছিল তা তার কাজের দিকে নজর দিলে কিছুটা আঁচ করা যেতে পারে।

একটি গান ও ছোট্ট মহলানবীশ

'এসো এই পতাকা তলে/আমরা সবাই মিলে/শপথ লইব দেশকে জাগাব/ভেদাভেদ যাব ভুলে/শান্তির গান আমরা গাইব/অভিযাত্রী দল/ দেশের স্বার্থ মোদের স্বার্থ/দেশের বলই বল।' পঞ্চাশের দশকে এই গানটি লিখেছিলেন বুলবুল মহলানবীশের বাবা অরুন কুমার মহলানবীশ। ১৯৫৭ সালে পুরান ঢাকার নারিন্দায় 'অভিযাত্রিক' নামে একটি সংগঠন যাত্রা করেছিল। সেই সংগঠনটির তাৎপর্য তুলে ধরতে এই গানটি লিখেছিলেন তিনি। অভিযাত্রিকের প্রতিষ্ঠাতাকালীন সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সওগাত পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন, রোকনুজ্জামান খান দাদা ভাই, ভুপেন্দ্র ভৌমিক, আবেদ খান, অমলেন্দু চক্রবর্তী, রাজিউদ্দিন আহমেদ, বরুণ কুমার মহলানবীশ, অরুন কুমার মহলানবীশসহ আরো অনেকে। গানটির সুর করেছিলেন অমলেন্দু চক্রবর্তী। গানটি ছোট-বড় নারী-শিশু সকলে মিলে গাইতেন অভিযাত্রী ক্লাবে। এই গানে সর্বকনিষ্ঠ একজন কণ্ঠ মেলাতেন। যার বয়স ছিল চার। গানটি যিনি লিখেছিলেন তিনি বিকেল বেলায় অফিস শেষে বাড়ি ফিরে তরুণদের সঙ্গে নিয়ে ভলিবল খেলতেন। চার বছরের মেয়েটির মনে হয়েছিল গানের শেষ কথাটি 'বলই বল' মানে 'ভলি বল', যা বিকেল বেলায় মাঠে তার বাবা অন্যদের সঙ্গে প্রতিদিন খেলেন। শিশুটি ক্লাবে যেমন বাবার সঙ্গী তেমনি বিকেল বেলায় বাবার ভলি বল খেলার দর্শক। পরে তার বাবা তাকে 'ভলি বল' আর 'বলই বল' এর পার্থক্য বুঝিয়ে বলেছিলেন।

বুলবুল মহলানবীশের শিক্ষাজীবন

বুলবুল মহলানবীশের পড়াশোনা শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী লীলা নাগ প্রতিষ্ঠিত নারীশিক্ষা মন্দিরে। এর পরের শিক্ষালয় পোগোজ স্কুল। এই দুই বিদ্যাপীঠের শিক্ষার্থী হতে পেরে বুলবুল মহলানবীশের গর্বের অন্ত ছিল না। বুলবুল মহলানবীশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করেছেন। দেশে-বিদেশে শিক্ষকতা করেছেন দীর্ঘদিন।

কোনো দিন দ্বিতীয় হননি বুলবুল

সমাজ সচেতন সংস্কৃতিবান পরিবারের সদস্য হিসেবে ছোটবেলা থেকেই লড়াই করেছেন সব রকম অসংগতির বিরুদ্ধে। বাবা-মায়ের উৎসাহেই আবৃত্তি ও সংগীত চর্চার পাশাপাশি ছড়া-কবিতা-গল্প লেখার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। শৈশব-কৈশোরে আবৃত্তি ও সংগীত প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হননি কখনো। জেলা সংগীত প্রতিযোগিতায় পেয়েছেন

স্বর্ণপদক। ১৯৯০ সালে বারীণ মজুমদার পরিচালিত 'মনিহার সংগীত একাডেমী' থেকে ডিস্টিংশনসহ প্রথম হয়ে বিশ্ববরেণ্য বেহালাশিল্পী পণ্ডিত ভিজি যোগের হাত থেকে নিয়েছেন সনদপত্র। পেয়েছেন 'সংগীত মণি' উপাধি। ১৯৬৯ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরপরই নিয়মিত তালিকাভুক্ত শিল্পী হিসেবে রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্র ও টেলিভিশনে নিয়মিত সংগীত পরিবেশন এবং নাটকে অভিনয় করেছেন।

বুলবুল মহলানবীশের কর্মজীবন

১৯৭৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স পাস করার পর প্রকৌশলী স্বামী মুক্তিযুদ্ধের সাব সেক্টর কমান্ডার সরিত কুমার লালার সঙ্গে আবুধাবি যান। সেখানে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। ১৯৮৭ সালে ঢাকায় ফিরে এসে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে সংস্কৃতিকর্মী হিসেবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৬ বছরের দীর্ঘ বিরতির পর ১৯৯২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। পুনরায় আবুধাবি যান এবং শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত হন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী বুলবুল

১৯৫৭ সালের সেই চার বছরের শিশুটিই হয়েছিলেন বুলবুল মহলানবীশ। যিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের একজন শিল্পী হিসেবেই সমধিক পরিচিত। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর কলকাতায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয় 'বিজয় নিশান উড়ছে ওই' গানটি। বাঙালির বিজয়ের ঐতিহাসিক ক্ষণে কালজয়ী গানটিতে কণ্ঠ দেওয়া শিল্পীদের অন্যতম ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা বুলবুল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত জনপ্রিয় ধারাবাহিক নাটক 'জল্লাদের দরবার'-এ মূল নারী চরিত্রে অভিনয় এবং সংগীতে অংশগ্রহণ করেছেন। একই সময়ে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে আমন্ত্রিত হয়ে পরিবেশন করেছেন নজরুল সংগীত।

স্বাধীনতার পর বুলবুল মহলানবীশ

স্বাধীনতার পর দেশের সংস্কৃতি অঙ্গনের উজ্জ্বল প্রতিনিধি ছিলেন তিনি। সর্বোপরি দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। নজরুলসংগীত শিল্পী বুলবুল মহলানবীশ 'নজরুলসংগীত শিল্পী পরিষদ'র সহসভাপতি ও রবীন্দ্র একাডেমির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। জাতীয় কবিতা পরিষদ, কচিকাঁচার মেলা, উদীচী, সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শিল্পী পরিষদসহ বহু সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ভাইবোন ফোটা ও রাখিবন্ধন উৎসব উদযাপন জাতীয় কমিটির সভাপতি ছিলেন। বুলবুল মহলানবীশের গানের অ্যালবাম রয়েছে কয়েকটি।

সাহিত্যিক বুলবুল

নিয়মিত সাহিত্য চর্চা করতেন বুলবুল মহলানবীশ। প্রকাশিত হয়েছে বিশটি গ্রন্থ। 'মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব প্রস্তুতি ও স্মৃতি '৭১' তার বহুল আলোচিত বই। তিনি লিখেছেন ছড়া কবিতা কথাসাহিত্য এবং প্রবন্ধ। লিখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলকে নিয়ে সমৃদ্ধ এক প্রবন্ধ গ্রন্থ। মাসিক 'অরিত্র' পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন তিনি। তার প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে আরও আছে 'পারস্য উপসাগরের তীরে' (ভ্রমণ কাহিনী), 'সংহিত সংলাপ' (কবিতা গ্রন্থ), 'নীল সবুজের ছড়া'। সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অবদানের জন্য পেয়েছেন চয়ন স্বর্ণপদক, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ফাউন্ডেশন সম্মাননা, পশ্চিমবঙ্গের নজরুল একাডেমি সম্মাননা পদক।

পাওয়া না পাওয়া

রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার পাননি বুলবুল মহলানবীশ। তবে ওসব না পাওয়াতে তার মাঝে কোনো খেদ ছিল না। পুরস্কার বা স্বীকৃতিকে খুব কম গুরুত্ব দিতেন তিনি। আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদা বিকিয়ে দেননি কখনো। দৃঢ় ব্যক্তিত্ব দিয়ে তিনি নিজের অস্তিত্ব জানান দিতেন।

আলোর লড়াই চালিয়ে যাও

কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী প্রতিভার এই দ্যুতি আর আলো ফেরি করে চলা সংস্কৃতিকর্মী বুলবুল মহলানবীশকে আশীর্বাদ করে 'আলোর লড়াই চালিয়ে যাও' শিরোনামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। বুলবুল মহলানবীশ 'আলোর লড়াই' চালিয়ে গেলেন শৈশব থেকে। একাত্তরে বীর মুক্তিযোদ্ধা হয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। মুক্তিযুদ্ধের সাব সেক্টর কমান্ডার সরিত কুমার লালার সঙ্গে আলোর লড়াইয়ের লড়াকু বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষার আগেই ছাত্র ইউনিয়নে নাম লিখিয়েছিলেন। আর আমৃত্যু আলোর লড়াই চালিয়ে চির বিদায় নিলেন এই শিল্পী।